দুই মহৎপ্রাণ, দুই পয়সার ঝুলন্ত লাশ এবং নতুন বছরের প্রত্যাশা

আজকে ভেবেছিলাম, পৃথিবীর অতি পুরোনো ও ঘুনে ধরা মানচিত্রটাকে ‘আধুনিকীকরণ’ ও ‘সন্ত্রাসমুক্ত’ করতে বিশ্বের এক নম্বর দানব পরাশক্তির পরিকল্পনা নিয়ে একটু লিখব। প্রাচ্যের কন্যার মৃত্যু (যার কারন কখনো জানা যাবেনা এবং প্রতি বছরই মৃত্যুবার্ষিকীতে ডায়ানা ও কেনেডির মত অসংখ্য কন্সপিরেসী থিওরীর জন্ম দিয়ে যাবে) ও আরো চমক আছে এমন ঘটনা ঘটার দ্রুত আশংকা, গ্লোবাল পলিটিক্সের চলমান ধারার সাথে বাংলাদেশের এখনকার অবস্থার সাযুজ্যতা এবং মুসলিম বিশ্বের বর্তমানে (আগে ছিল ইরাক) সবচেয়ে শক্তিশালী সেনাবাহিনীকে জনগনের মুখোমুখি ফেলে ওই একই ফর্মুলা ‘অকার্যকর রাষ্ট্রের’ ধারনা কার্যকর করে তালেবান ও আল কায়েদার হাতে চলে যাওয়ার আশংকা সৃষ্টির মাধ্যমে পারমানবিক শক্তি কুক্ষিগত করা, উপমহাদেশের সুপার ডুপার পাওয়ারকে একচ্ছত্র অধিপতি বানিয়ে ভারসাম্যহীন অঞ্চল প্রতিষ্ঠার বাসনা ও ‘অছিয়ত নামার’ গনতন্ত্র নিয়ে লিখব। গতবছরে ‘মুখের ভিতর পা (Foot in Mouth)’ পুরস্কারপ্রাপ্ত পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর মানুষটির মধ্যপ্রাচ্যের ছেড়া ম্যাপের নিউ ভার্সন ও দক্ষিণ এশিয়ার ফাপা মানচিত্রটাকে ফুটো করার কোশেশ নিয়ে লিখব। অদ্ভূত ও মাথামোটা কথা বলার জন্য প্রতিবছর প্লেইন ইংলিশ ক্যাম্পেইন (Plain English Campaign) নামক একটি সংস্থা এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করে থাকে। আমেরিকার সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী ডোনাল্ড রামস্‌ফেল্ড পেয়েছিলেন ২০০৩ সালে। বর্তমানের ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন অর্জন করেছিলেন ১৯৯৪ সালে। বুশের আজব কথাবার্তা নিয়ে উক্ত সংস্থাটির মুখপাত্র বেন বিয়ার (Ben Beer) বলেন, তারা নিশ্চিত ধরেই নিয়েছিলেন এই পুরস্কারটি গেল বছরে তিনিই পেতে যাচ্ছেন, কারন প্রতিটা দিনই উনি এসব ওজনহীন কথাবার্তা নিয়েই বাস করেন।‘ ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের অধিবেশনে খুব সাধারন কিছু ইংরেজী শব্দের উচচারন (যেমন, Nuclear) নিয়ে জটিলতা তাকে বেশ বেকায়দায় এবং বিশেষকরে আমেরিকানদের লজ্জায় ফেলে দেয়। ওই মাসের শুরুতে একদিনতো বলেই ফেলেছিলেন, ‘প্রয়াত নেলসন ম্যান্ডেলা’, অথচ তিনি কিনা এখনো জীবিত। ২০০৪ সালের অগাষ্টে একটি টেলিভাইজড মিটিংয়ে তার আলোচিত আরেকটি উক্তি হলো , Our enemies are innovative and resourceful- and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people- and neither do we (আমাদের শত্রুরা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম ও উপকরন সমৃদ্ধ এবং আমরাও এমনই। তারা যেমন আমাদের দেশ ও জনগনকে ধ্বংস করার জন্য নতুন পন্থা উদ্ভাবন খোজা বন্ধ করেনা এবং আমরাও তা করিনা)। ক্যালিফোর্নিয়ায় ভয়ংকর অগ্নিতে ক্ষতিগ্রস্থদের দেখতে এসে এবছর তিনি বলেছিলেন, “All I can tell you is that when the governor calls, I answer his phone (আপনাদেরকে এই বলতে চাই যে, যখন গভর্নর ফোন করেন আমি তার উত্তর দেই)”। ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় এমন অপ্রাসংগিক কথা বলার মানুষ দুনিয়াতে আর দুইটি পাওয়া যাবে কিনা তা নিয়ে ঢের সন্দেহ!

কিন্তু ঘটনাবহুল গত বছরের দুইটি মানবিক ঘটনা আজকের আলোচনার প্রসংগ ঘুরিয়ে দিল।

সাত বছরের ছোট্ট পরীর মত ইরাকী মেয়ে যাহ্‌রার দৃষ্টি ফিরে পাবার কাহিনী

আমেরিকান আর্মি সার্জেন্ট জনি কেম্পেন (Johnny Kempen) ইরাকের কোন এক গ্রামে নিয়মিত টহল দিচ্ছিলেন। প্রতিদিনের মত আজও শিশুরা দৌড়ে আসছিল ক্যান্ডি ও চকোলেট নেয়ার জন্য। আর সব শিশুর মত দৌড়ে না এসে দূর থেকে দাঁড়িয়ে থেকে যাহ্‌রার চোখ পিট পিট করা, মহৎ হৃদয়ের এই সার্জন্টের নজর এড়ায়নি। ঘুমানো বাদে সারাক্ষনই যাহ্‌রার মনে হত চোখের মধ্যে বালুর কণা নড়াচড়া করে। কি ভয়ংকর অবস্থা!

পরস্পরের ভিন ও শত্রুদেশী এই সৈন্য এবং প্রায় অন্ধ এই শিশুটির মধ্যে দুর্বোধ্য ভাষার বাইরে মনোজগতে ভালবাসার একটি সেতু তৈরি হয়ে গেল। মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশনিষ্ট মা ও লায়ন ক্লাবে জড়িত বোনের সাথে ইমেইল চালাচালি করলেন জনি। নিজের সদিচ্ছার কথা জানালেন। বললেন, To relieve that pain would be the icing on the cake (তার দূঃসহ সেই বেদনা দূর করাই হবে চূড়ান্ত কাজ)। সবাই এগিয়ে এল। যাহ্‌রা ও তার দাদীকে আমেরিকায় পাঠিয়ে চিকিৎসাসহ যাবতীয় দেনা বহন করল একটি সংস্থা। দুইবার বড় অপারেশন শেষে প্রায় ৬ মাস পর মেয়েটি ফিরে এল পূর্ণ

উজ্জ্বল দুটি চোখ নিয়ে। বাড়িতে এসে এবার সে সবার সাথে দৌড়াচ্ছে। মাকে, বাবাকে জড়িয়ে ধরছে, ছোট ভাইটির সাথে সে খেলছে, টেডি বিয়ার নিয়ে ছোটাছুটি করছে, স্কুলে যাবে, আরো কত কথা। মা, বাবা, দাদী সবাই আনন্দে কাদছে। সে এক আনন্দঘন দৃশ্য!

রমিজ উদ্দিনের জীবন ফিরে পাবার কাহিনী

গত বুদ্ধিজীবি হত্যা দিবসে পুলিশের আইজি নুর মোহাম্মদের এক মহানুভবতারও খবর ঢাকা থেকে প্রকাশিত সব দৈনিক ছাপে। সোনার হরিনের নাগাল পাওয়ার আশায় বিয়ানী বাজারের রমিজ উদ্দিনের নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফেরত আসার কাহিনী। পনেরো দিন মরু প্রান্তরে অর্ধাহারে, অনাহারে কাটানো, কৃষ্ণাঙ্গদের দ্বারা হামলা এবং শেষে তার ভাষার ‘এই স্যার (আইজিপি) না থাকলে আমি মনে হয় জীবনে দেশে আসতাম পারতাম না। বউ পোলাপানের মুখও দেখতে পারতাম না। নির্যাতনের কারনে আমার হার্ট দুর্বল হয়ে গেছে।‘ জমিজমা বিষয় আসয় বিক্রয় করে প্রতারণার শিকার হয়ে আমাদের দেশের মানুষজনের বিদেশ বিভূইয়ে জংগলে পালিয়ে বেড়ানো, মরুভূমির মধ্যে মৃত্যু, অনাহারে জাহাজে চড়ে অজানার উদ্দেশ্যে নিরন্তর যাত্রা ইত্যাদি নতুন নয়। তবে রাষ্ট্রের উঁচু পর্যায়ের মানুষজনের দ্বারা এমন মহানুভবতার ঘটনার বহিঃপ্রকাশ সত্যি নতুন! সেজন্য সবাইকে ডেকে এনে বলতে হয়। ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলতে হলেও বলা উচিত, বেশী মানুষদেরকে জানানোও উচিত। কারন, এমন কিছু ভালো কাজ যদি উপরতলা থেকে করা হয় তবে এর প্রভাব অবশ্যই নিচের দিকে গড়ায়। এই যে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রহস্যজনকভাবে খোয়া যাওয়ায় সংগত কারনেই এর দায়ভার নিয়ে আমাদের এক উপদেষ্টা চলে গেলেন, ধরা ছোয়ার বাইরে থাকা একাদশমন্ডলীর ভেতর থেকে আরো চার নক্ষত্র খসে পড়ল, মানুষজন গতানুগতিকভাবে কিছুদিন পর ভুলে গেলেও এর প্রভাব নিহারিকাপুঞ্জের উপর কিন্তু অবশ্যই পড়বে।

দূর্নীতির প্রতীক সুরম্যপ্রাসাদ রেংগস (Rangs Bhaban) ভবন রাজধানীর বুকে গড়ে উঠেছিল সর্বোচচ প্রযুক্তি ব্যবহার করে, আর তা ভাংতে গিয়ে আদিম প্রযুক্তি হাতুড়ি, শাবল ব্যবহার করে কতজন মানুষের জীবন যে চলে গেল তার দায় কি কারো উপরই পড়ে না? পদত্যাগ তো দূরের কথা, কেউ দেখতে যাওয়ার সময়ও পাননি! কোন রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় থাকলে যে কি হত, তা সহজেই অনুমেয়! বেচারাগুলো লোহাবিদ্ধ হয়ে মরেও শাস্তি থেকে রক্ষা পাননি। সপ্তাহের বেশী দিন ধরেও গন্ধ ছড়াতে হয়েছে, সে গন্ধে অনতিদূরেই বিজয় দিবসের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে আসা উদ্যম, কর্মচঞ্চল অফিসারদের না হলেও তাদের সহধর্মিনীদের নাকে হয়তো বারে বারে রুমাল দিতে হয়েছে। গাড়ীর জানালার গ্লাস বন্ধ করে উপদেষ্টাদের হয়তো কয়দিন কষ্টকরে যাতায়াত অথবা চৌকষ বাহিনীর বদৌলতে রাস্তা বদল করতেও হয়ে থাকতে পারে। ঝুলে থাকা পায়ের দিকে তাকিয়ে প্রিয়জনদের লাশ নিতে আসা অসহায় আলাউদ্দিনদের কান্না চট্টগ্রামে তো আর পৌছতে পারেনা! সেদিন সেখানে চলছিল নতুন অফিসারদের ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠান, প্রধান উপদেষ্টা অত্যন্ত ব্যস্ত দিন অতিবাহিত করছিলেন। বঙ্গভবন, গণভবন, সেনাভবন, নামকরা সব ইত্যাদি ভবনের সন্নিকটে মরেও নন-হালাল লাশদের থাকতে হয়েছে দিনের পর দিন। হারানো অমুল্য পুরাকীর্তি, বিষ্ণুমূর্তির নিঃশ্বাসে সারা দেশের বাতাস ভারী হয়ে যায়, সীমান্তে রেড এলার্ট জারি করা হয়, দুইদিন দু’জন করে গ্রেফতার করে করে রিমান্ডে নেয়া হয়, মানব দরদী (ব্যঙ্গ করে কেউ বলেন, শুধুই মূর্তি দরদী)-রা পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লেখেন, কিন্তু জীবন্ত মুল্যহীন লাশদের নিয়ে মানবতাবাদীদের মহানুভবতা বা কিঞ্চিত ভালবাসা উতরে উঠতে দেখলাম না। একটা অখ্যাত হিউম্যান রাইট্‌স অর্গানাইজেশন ছাড়া কেউই টু শব্দটি পর্যন্ত উচচারন করলেন না। যাহোক, এগুলো এখন পুরোন দিনের গল্প।

এই গল্প নিয়েই অবাধ্য একজন তরুন কার্টুনিষ্ট বিখ্যাত হওয়ার জন্য তুলি নিয়ে বসল। ১৯৪০ সালের মন্বন্তরের লাশ নিয়ে মানুষের সাথে কাক শকুনের কাড়াকাড়ির সেই দৃশ্যের বাস্তব সদৃশ ছবি একে জয়নুল আবেদীন শিল্পাচার্য ও বিখ্যাত হয়েছিলেন। সেও চাইলো এমন কিছু একটা করতে। উজীর, নাজীর ও সিপাহসালার নিয়ে রাজা বেড়াতে গেছেন রাজধানীর সবচেয়ে উঁচু প্রাসাদে। মজা করে সবাই এ তলা ও তলা ঘুরে ফিরে দেখছেন। মুহুর্তেই অঘটনটি ঘটে গেল। হঠাৎ পা ফসকে রাজা চৌদ্দ তলা থেকে পড়ে আটকে রইলেন ছয় তলায়, হতোদ্যম উজীর তাই দেখে কোন দিশা না পেয়ে লাফ দিলেন নীচে। আর নীচেই চলছিল আরেকটি দালান নির্মানের কাজ। বীমের ধারালো লোহাগুলো তাক করাই ছিলো। তিনিও

আটকে গেলেন তাতে। অপর দুই বুদ্ধিমান সঙ্গী আর ভুল করলেন না। নীচে নেমে এলেন। তারপর কি করলেন? কিভাবে উপসংহার টানবে তা আর মেলাতে পারছে না ওই কার্টুনিষ্ট। জনগনকে সাথে নিয়ে ঝুলে থাকা অতি দামী লাশ দুটির দৃশ্য উপভোগ করলেন, নাকি ঝুকির মুখে কাউকে না ফেলে নগরের সব নির্মান শ্রমিক, ফায়ার সার্ভিস, ইঞ্জিনিয়ারদের ছুটি দিয়ে বললেন, এগুলো উদ্ধার করা আর সম্ভব নয়। পচতে দিন, কিছুদিন পর এমনিতেই সব ঠিক হয়ে যাবে, চলুন সবাই কুচকাওয়াজে যোগ দেই, নতুন অফিসারদের সার্টিফিকেট দেই- আর ভাবতে পারল না তরুন শিল্পীটি। বিখ্যাত হওয়ার শেষ আশাটুকু সে ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র মনযোগ দিল।

আসুন, আমরা এবার অল্প একটু মনযোগ দিই বিবেকের কাছে। বিবেকের নিকট দায়বদ্ধতা না থাকলেও দূর্নিতির মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়লেও পলিটিশিয়ানদের তো জনগনের নিকট বাধ্য হয়ে একসময় হিসাব দিতে হয়। একটা সময় পর পর তাদের নিকট কাচুমাচু হয়ে ফিরে যেতে হয়। কিন্তু জনগনের নিকট যাদের কোন দায়বদ্ধতাই নাই তারা কি করবেন? বিবেক ও মুল্যবোধ দ্বারাও কি তারা তাড়িত হবেন না? যাদের মহৎ প্রানের প্রচেষ্টায় যাহ্‌রা ও রমিজ উদ্দিনের জীবন নিশ্চিত ধ্বংসের কিনারা থেকে পরশ পাথরের ছোয়ায় বাচিয়ে রেখেছে, সেরকম হওয়া কি খুবই অসম্ভব? নতুন বছরে না হয় এমন অসম্ভব আশাটুকুই করি, এমন মহতপ্রাণ মানুষদের পদচারনা দেশময় ভরে যাক, সাথে সুস্থির গনতন্ত্র ফিরে আসুক বিবেক ও জনগনের কাছে দায়বদ্ধতা নিয়ে এবং ফিরে যাক সবাই স্ব স্ব কর্মস্থলে দানব অসুরের পরিবর্তে মুল্যবোধের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে।

* যায়যায়দিন ১১ই জানুয়ারী ২০০৮ এ প্রকাশিত।